International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-II, March 2024, Page No.46-54
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i2.2024.46-54

বরাক উপত্যকার নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প: অস্তিত্ব সংকটের নানা মাত্রা

জয়শ্রী দত্ত চৌধুরী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract:

Barak Valley is a region located in the southern part of Assam, comprising the districts of Cachar, Hailakandi, and Karimganj. Despite the presence of various communities, here, the predominant linguistic group is Bengali. The region has been marked by a turbulent history, including partition-related upheavals, linguistic conflicts, economic crisis, national identity issues, communal riots, etc. — which have shaped the psyche of its residents. The consciousness of the Bengali population living in this region against these various forms of conflict, aggression, and resistance is reflected in the region's literature in various ways. The topic which we are discussing about is Barak Valley's selected Bengali short stories: various aspects of the crisis of existence.

Key words: Barak Valley, Partition, linguistic conflicts, economic crisis, national identity issues.

বৃহত্তর ‘বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন’ বলে আমরা যাকে জানি তারই এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ বরাক উপত্যকা। দক্ষিণ আসামের এই প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকা কাছাড় হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন জনজাতির বসবাস থাকলেও এখানকার জনসম্পদের প্রধান ভাষিক গোষ্ঠী হল বাঙালি। দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন, ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংকট, জাতিসত্তাগত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও তদজনিত দাঙ্গা ইত্যাদির ফলে প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বরাকবাসীর মনোজগৎ আবৃত। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও নানা সময়ে, নানা ভাবে উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের কাছে নিপীড়িত হতে হয়েছে বরাকবাসীদের। এই অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালিদের চেতনাবিশ্বে এই সংঘাতের নানা রূপ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা বরাক উপত্যকার ছোটগল্পে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবিম্বিত এই নানা দিকের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আজকের বরাক উপত্যকা মূলত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশের সুরমা উপত্যকার এক খন্ডাংশ। ‘বরাক’ শব্দটি ‘বরবক্র’ শব্দজাত। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বরাকভূমির উত্তরে আসামের ডিমাহাসাও জেলা এবং মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া হিলস, দক্ষিণে মিজোরাম, পূর্বে মনিপুর, পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান,

জৈনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চল বলে নানা জাতিগোষ্ঠীরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন কাছাড়ি, মনিপুরি, কুকি, নাগা, মিজো, রিয়াং, ডিমাসা, ত্রিপুরি, কোচ, চরই, খাসিয়া, সাঁওতাল, চা শ্রমিক প্রভৃতি। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য আসামের বরাক উপত্যকা এক মিশ্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আজকের বরাক উপত্যকা বলতে যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝায় সেই অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন নানা ভাবে বহু আগে থেকেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা ডক্টর সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি

> ‘‘কাজকর্মে বাংলা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।’’[১]

সেই ধারাবাহিকতাতেই পরবর্তীকালে প্রাগাধুনিক থেকে আধুনিক যুগেরও সাহিত্যের নানা সংরূপের চর্চা এই অঞ্চলের বাঙালির মধ্যে দেখা যায়। এখানকার কথাসাহিত্য মূলত লিটিল ম্যাগাজিন বা ছোটপত্রিকা নির্ভর। ১৯১৫ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ‘শ্রীভূমি’র হাত ধরে গল্পের যাত্রা শুরু হয়। ‘ভবিষ্যৎ’ (১৯২৬) ‘বিজয়িনী’ (১৯৪০) ছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ‘সম্ভার’ পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হত। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আত্মপ্রকাশ করে বরাক উপত্যকার প্রথম ছোট পত্রিকা ‘কিশোর’ (১৯৫১-৫২)। পরবর্তীতে দেশভাগ জনিত ভাঙা-গড়ার পর ‘অনিশ’(১৯৬৯) ‘শতক্রতু’(১৯৭৩)র মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে বরাকের বাংলা ছোটোগল্প। তাছাড়া ‘প্রতিশ্রুত’, ‘প্রবাহ’, ‘অক্ষর’, ‘শরিক’, ‘মানবী’ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট পত্রিকা যার মধ্যে কোনটা স্বল্পায়ু আবার কোনটা আজও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

এই সন্দর্ভে যে গল্পকারদের লেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৭-২০১৫): বরাক উপত্যকার ছোটগল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম উচ্চারণ করতে হয় ‘অনিশ’ সম্পাদক শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ ‘যে গল্পের শেষ নেই’ (২০১০)। তাছাড়াও নানা ছোটপত্রিকা এবং বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বের নির্বাচিত গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে তাঁর কয়েকটি গল্প। শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর কয়েকটি গল্প যেমন –‘আশ্রয়’, ‘মানুষ মানুষের জন্য’, ‘বুমেরাং’, ‘তৃতীয় দর্শন’, ‘ফাঁদ’ ‘সময়ের ইন্টারভিউ’ ইত্যাদি।

মলয়কান্তি দে: দক্ষিণ আসামের সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের দেশভাগে বাস্তুচ্যুত এক পরিবারে মলয়কান্তি দের জন্ম। শেখর দাসের সময়কার অন্যতম শক্তিমান গল্পকার মলয়কান্তি দে। বর্তমানে তিনি কলকাতায় থাকেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প- ‘কমলা রঙের শাড়ি’, ‘আসরাফ আলির স্বদেশ’, ‘যুদ্ধের পায়রা’ ইত্যাদি।

দেবব্রত চৌধুরী (১৯৬১): প্রান্তিকায়িত জীবনের সার্থক রূপকার দেবব্রত চৌধুরীর জন্ম কাছাড়ের এক চা বাগানে। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন আব্বাজানের হাড় (২০১৬)। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প- ‘কাক’, ‘রাতের প্রহরী’, ‘মুখচ্ছবি’ ইত্যাদি ।

শেখর দাস (১৯৫২): বরাক উপত্যকা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেন কথাসাহিত্যিক শেখর দাস। তাঁর তিনটি উপন্যাস -’বিন্দু বিন্দু জল’, ‘মোহনা’, ‘রাঙামাটি’ ও গল্পগ্রন্থ

‘কোষাগার’। শেখর দাসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প –‘কোষাগার’, ‘আজান’, ‘ফেরারি’, ‘জনসভা’, ‘শ্বেতরক্তকণা’ ইত্যাদি ।

পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে বারংবার ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা যখন বরাকবাসীর চেতনায় নিরন্তর ঘুরপাক খাচ্ছে, স্থায়ী ঠিকানা খুজঁতে খুজঁতেই আবার ‘বঙাল খেদা’, ‘বিদেশী বিতাড়ন’ ইত্যাদি আন্দোলনের শিকার এই অঞ্চলবাসীরা। অসমে বাঙালি জাতিসত্তাগত অস্তিত্ব সংকটের গল্প ‘অনিশ’ সম্পাদক শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর ‘আশ্রয়’। গল্প অবলম্বনে দেখা যায়, দেশভাগের পর নিজ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোন এক গ্রামে পুনরায় বসতবাড়ি গড়ে তোলা এক বৃদ্ধের কাছে আশির দশকের গোড়ায় ‘বিদেশী বিতাড়ন’ আন্দোলনের দিনে গ্রাম ছাড়ার নোটিশ আসে। স্মৃতিকাতরতা থেকে বেরিয়ে যে বৃদ্ধ আপন করে নিয়েছিল নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন জায়গাকেই –

> “এই জল-মাটি কবেই আপন করে নিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছিল জন্মসূত্রে এ ভূমি তার নয়। আজকে তার চিন্তা-ভাবনা, আশা-আনন্দ সবকিছুই এই মাটিকে ঘিরে।...এমনকি এই মাটিতে তার অবস্থানও সুদৃঢ়, সুনির্দিষ্ট।”[২]

কিন্তু আদৌ কি তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট ছিল? কিছুদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ হাতে আসা লিফলেটের মাধ্যমে জানতে পারে পনের দিনের মধ্যেই গ্রাম ছাড়তে হবে তাকে। ভূমিপুত্র ছাড়া কারো ঠাঁই হবে না এ রাজ্যে। অসহায় বৃদ্ধের মনে পূর্বস্মৃতির সঙ্গে ভিড় করে আসে দুঃস্বপ্ন, এক বুক হতাশা–

> “সেই কবে ছোট্ট অরিন্দমকে বুকে নিয়ে এক বস্ত্রে ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালাতে হয়ে ছিল প্রাণের মায়ায়।...সেদিন মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র নিপুণ হাতে কে কেটেছিল জানে না বৃদ্ধ। কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেখানে নোঙ্গর ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সেটি এই মাটি। তারপর ভাষা এক না হলেও আত্মীয়ের আন্তরিকতায় পুরনো স্মৃতির ওপর কবেই পলিস্তর জমে আশ্রয়ের দ্বীপ হয়ে উঠেছিল এই মাটি।”[৩]

এই মাটিই যে এত রুক্ষ হয়ে উঠতে পারে, বৃদ্ধের কাছে তা ছিল ভাবনার অতীত, বলা ভালো কল্পনার অতীত।

অবশেষে আবারও ভিটেমাটি ছেড়ে নাতির হাত ধরে বৃদ্ধ আজ রাস্তায়, আবারও আশ্রয়ের সন্ধানে–

> “প্রথমবার নাড়ি ছিন্ন করেছিল ধর্ম, দ্বিতীয়বার করল ভাষা।... প্রথমবার বেরিয়েছিল ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে । আর এই দ্বিতীয়বার চলতে হচ্ছে ছোট্ট নাতির হাত ধরে । আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের এ যাত্রার বোধ হয় শেষ নেই ।”[৪]

বৃদ্ধের মনে ভিড় করে আসা ক'টা অমোঘ প্রশ্ন পাঠকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গল্পের ইতি টানেন লেখক–

> ‘আমরা বিদেশী, বহিরাগত। কিন্তু কোন্ বাইরের দেশ থেকে এলাম আমরা? একই দেশে তো ছিলাম। আমরা বিদেশী হলাম কি করে?...ভূমিপুত্র মানে কি আদিম অধিবাসী? সে আদিমকে কি এখন আর খুজেঁ পাওয়া যাবে? নাকি ভূমিকে যে মায়ের মত ভালোবাসে সে ভূমিপুত্র?’[৫]

বৃদ্ধের এই প্রশ্নগুলো পাঠক-মনকে শুধুমাত্র নাড়াই দেয়না, এ যেন বরাকবাসীর, এমনকি সমগ্র আসামবাসীর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারা আসাম বারংবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল 'বিদেশী সমস্যা'য় উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের কাছে নানা সময়ে, নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছে অনসমিয়ারা; বিশেষ করে বাঙালিরা। বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাও তথাকথিত 'বিদেশী সমস্যা'কে এড়িয়ে যেতে পারেনি, শিকার হয়েছে প্রবল হিংসার। এমনই এক গল্প মলয়কান্তি দে'র 'আসরাফ আলির স্বদেশ'। 'বিদেশী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া আসরাফ আলি ও তার পরিবার সহ মোট এগারোজনকে নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকে পুলিশ ভ্যান ছুটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা ঘটে। গল্পকার অন্ধকার প্রকৃতিকে যেন প্রতিকী অর্থে ব্যবহার করেছেন আসরাফদের অবস্থানকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য-

> "আকাশ অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাতাসও অন্ধকার। অন্ধকারে ডুবে আছে দু'পাশের মাঠ, জলা, বন ও বসতি। ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলোর সামনে ও পেছনে অন্ধকার।"[৬]

গল্প অবলম্বনে আমরা জানতে পারি আসরাফ আলিদের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বাধ্য হয়ে বরাক উপত্যকায় আশ্রয় নেওয়ার কাহিনী। তার মনে হয়েছিল—

> "কোথায় যাবে তারা! কোথায়? সাত পুরুষের ভিটে, জমি - জিরেত কেন ছেড়ে দিতে হয়? কেন ফেলে আসতে হয় প্রিয়জন - পরিজন? কোথায় পালাতে হয় রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে?"[৭]

ছোট আসরাফ সেদিন তার মনে ভিড় করে আসা এই প্রশ্নগুলোর কোন জবাব পায়নি। সেদিন পাশের বাড়ির নানাজী শুধু সতর্ক করে দিয়েছিল—

> "যাইরায় যাও। হিন্দুস্থানো গিয়াউ কুনু সুখ পাইবায়নি। গেলা তো কত উ ...।"[৮]

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে অবশ্য-

> "অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল আসরাফ। যেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বেহেশতে চলে আসা। পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্তান।...যেন এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাওয়া।...কি এক ঘোরের মতন যেন লেগেছিল আসরাফের হিন্দুস্তান। ভারতবর্ষ। কোন আলাদা দেশ নয়। খেতে পাবার একটুখানি আশ্বাস যেন...।"[৯]

এই আশ্বাস, এই ভরসায়ই জঙ্গল কেটে ভারতে স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে বসত বানিয়েছিল আসরাফের বা-জান। সাপের কামড়ে তার আকস্মিক মৃত্যুর পর আসরাফের জমির দিকে চোখ পড়েছিল কাদের মিঞার। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী কাদের মিয়া আসরাফের বিরুদ্ধে মামলা করে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবেই মামলায় জয়ী হয় আসরাফ। তখন সারা দেশ ছিল বহিরাগত সমস্যায় জর্জরিত। মামলা জিতলেও শেষরক্ষা হয়নি আসরাফের । কাদের মিয়ার চক্রান্তে সে বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত হয়। অবশেষে সপরিবারে আসরাফ ও বিদেশী চিহ্নিত হওয়া আরো আটজন এসে দাঁড়ায় ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ড এর কাছে—

> "এগারোজন ভূতে পাওয়া মানুষের মতো হাঁটে। পায়ে যেন পাথর বাঁধা। তবু এগোতে হয়। পিচরাস্তা থেকে ওদের অন্য পথে নামানো হয়।"[১০]

আসরাফের মনে হয়—

> "পৃথিবীর কোথাও তার কোন দেশ নেই। পাকিস্থানে তার স্বদেশ কেড়েছে ইরফান চাচা, হিন্দুস্থানে কাদের মিঞা । স্বদেশ এখন তাদের মুঠোয় । আর আসরাফ? নো ম্যানস্ ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আসরাফ আসলে নো ম্যান্ - একটা নন এনটিটি।"[১১]

আসরাফদের করুণ পরিণতির কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় একটিমাত্র উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে—

"এখানে ওখানে ছেঁড়া কাপড়, রক্ত, একদিন দেখলাম উদোম ন্যাংটা একটি মরা মেয়ে মানুষ, বুক থেকে শেয়ালে খুবলে নিয়েছে মাংস।"[১২]

কিংবা, পুলিশ কনস্টেবলের ভাষায়—

'সব শুনলে আপনারা পিটবেন আমাদের। যা সব কান্ড হয় ওখানে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ ...।'[১৩]

হাজার হাজার স্বদেশ হারানো আসরাফদের করুণ পরিণতি তোলপাড় করে দেয় পাঠক-হৃদয়কে। গল্পের শেষে লেখককৃত এই মন্তব্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটে পাঠকের মনে বারবার,বহুবার—

"কারা পৃথিবীর বুকে চেকপোস্ট বসায়, আর মানুষের দুটো ফুসফুস হয়ে যায় দুটো দেশ।"[১৪]

এটাই আসরাফ আলিদের জীবন বাস্তবতা। স্বাধীনতার অন্য নাম তাদের কাছে উদ্বাস্তু জীবন। অস্তিত্বহীনতার সংকট থেকে কোনোকালেই মুক্তি পায়না আসরাফরা। তারা শুধু স্বপ্নেই দেখতে থাকে নিজ দেশ-ঘর-জমি-ফসল।

আসাম চুক্তির ফলে নিজ দেশেই 'বিদেশী', 'ডাউটফুল ভোটার', বা 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সংকটকে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। দেশের আইন-কানুন যেখানে সাধারণ মানুষের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে, যেখানে আর্থিক বা সামাজিক প্রতিপত্তিশালীদের কাছে প্রতিনিয়ত নির্বিবাদে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ, সেখানে মুক্তির সন্ধানে তারা শেষ পর্যন্ত নেমে যেতে পারে মনুষ্যত্বের চরম অবনমনে। এমনই এক জ্বলন্ত ছবি দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়': একটি প্রামাণ্য দলিল।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমিরুদ্দি পেশায় রিকশাচালক। স্থায়ী আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে-ঘুরে অসহায় আমিরুদ্দি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে জবরদখল কলোনিতে — যা

"শিরদাঁড়া সোজা না করেও থাকতে পারার মতো একটি আস্তানা।"[১৫]

কিন্তু 'দিন আনা দিন খাওয়া' আমিরুদ্দির সব তছনছ হয়ে যায় সরকারি নোটিশ পেয়ে—

"যদিও সরকারি ভোটার তালিকায় (১৯৮৯) আপনার/আপনার পরিবারের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবু আপনি কিংবা আপনার পরিবার ভারতীয় নাগরিক নন বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে । সুতরাং...।"[১৬]

এই নোটিস দেখামাত্র আমি রুদ্দির যেন পায়ের তলার মাটি সরে যায়। এক নিমেষেই যেন চেনা পৃথিবী অচেনা হয়ে যায় । এতদিন তার ধারনা ছিল—

"এটা সব মানুষেরই ভয়— যাদের সত্যিকারের এমন দুর্বলতা আছে। যারা রাতের চোরা অন্ধকারে সীমানা পার হয়ে এখন...নইলে এসব গুজব গুঞ্জন সময় গুজরানের, নিষ্কর্মা মানুষের একটা কিছু উত্তেজক আলাপে ওম পোহানোর স্বভাব।"[১৭]

আমিরুদ্দির বিশ্বাস—

"আমি তো জানি -এ মাটি আমার - এই দেশেরই মানুষ আমি, কবে কোন আদ্যিকালে বাপের সঙ্গে এপারে আসা। ওপার তো কবে তামাদি হয়ে গেছে স্মৃতির খাতায়।"[১৮]

অবশেষে তার দৃঢ় বিশ্বাস এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আতঙ্কে, হতাশায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অসহায় আমিরুদ্দি।

আসলে, শুধুমাত্র পূর্বপুরুষ সূত্রে দেশে থাকা, দেশকে ভালোবাসা, আপন ভাবার মধ্য দিয়ে কারো নাগরিকত্ব যে প্রমাণ হয় না, তারজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রমাণপত্রের- আমিরুদ্দির তা ভাবনার অতীত ছিল।

তাই আদালতে তার নাগরিকত্বের ব্যাপারে কি বিচার হবে তা ভাবতে গিয়ে আমিরুদ্দির বুক কেঁপে ওঠে। তার মনে হয়,

> "এপার না ওপার, মাঝখানে এক ত্রিশঙ্কু জীবন না আরও কোনও শাস্তি।"[১৯]

গল্পের কথাবস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে দশ বছরের জন্য সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আমিরুদ্দির মনে হয়েছে এ যে কুকুর বেড়ালের মতই বেওয়ারিশ জীবন অথবা তার চেয়েও অধম জীবন। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের আশায় দশজনের পরামর্শে আমিরুদ্দি যায় আলম সাহেবের কাছে। সরকারি দলের রাজনৈতিক নেতা আলম সাহেব বরাক উপত্যকা তথা সারা আসামের প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী আমিরুদ্দির কাছে টাকা চায়। দু-তিন হাজার টাকা জোগাড় করা যে আমিরুদ্দির পক্ষে অসম্ভব এটা বুঝেও আলম সাহেব বলেন—

> "খোদা জানেন, এ কেমন কঠিন ফাঁদ হে, কত ঘাটে ফেরি যে দিতে হবে তোমাকে।"[২০]

এর কারণও উল্লেখ করেন আলম সাহেব—

> "তোমার যে দলিলপত্র কিছুই নেই, কি দিয়ে 'দেশির' প্রমাণ দেবে তুমি?"[২১]

অসহায় আমিরুদ্দি তখন ভাবে—

> "দেশটা তার, এই আলো হাওয়া রৌদ্র, এই ফসল, এই জলে তার বৃদ্ধি, তার বেচেঁ থাকা, ভালোবাসা জড়ানো, আছে রক্তের টান। একটা সার্টিফিকেটের অভাবে কি এসব কিছু মিথ্যে, অস্তিত্বহীন?...অথচ তোমরা যাঁরা নিজেদের সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাগরিকত্ব নয় মনুষ্যত্ব পর্যন্ত ভুলে যাও, ভোটে জয়ী হতে দাঙ্গায় ইন্ধন দাও, দেশের উন্নয়নের টাকা নিজের কোষে ভরো, তারাই এক একটা সার্টিফিকেটের দৌলতে মহান দেশীয় ব্যক্তি হয়ে যাও।"[২২]

কিন্তু আমিরুদ্দির কাছে এই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের কোন পথ ছিলনা। ফলে 'বিদেশী' চিহ্নিত হওয়ার আতঙ্কে এমন নিকৃষ্টতম, অমানুষিক কাজ করতে বাধ্য হয় সে। যেভাবেই হোক আলম সাহেবের কথামতো 'ঘাটের ফেরি' দিতে তাকে টাকা জোগাড় করতেই হবে। আর তার এই অসহায়তারই সুযোগ নেয় গল্পের রহস্যময় চরিত্র শামাদ । শামাদই তাকে সন্ধান দেয় মানুষের হাড়গোড় সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবসার।

নিরুপায় আমিরুদ্দি বিদেশী হওয়ার নোটিশ ফেরানোর টাকা জোগাড় করতেই অবশেষে বেআইনি কঙ্কালের ব্যবসা শুরু করে। একদিন মধ্যরাতে তার আব্বাজান বদ্দিরুদ্দিকে গোর থেকে টেনে তোলে— 'এক পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার মতো।' যে বদ্দিরুদ্দি পুত্রের নাগরিকত্ব প্রমাণের সার্টিফিকেট রেখে যেতে পারেনি, সেই বদ্দিরুদ্দি সাত বছর মাটির নিচে ফেরারী জীবন কাটিয়ে এখন শুধু হাড়ের কাঠামো । এমন হাড়ের কাঠামোই তো আমিরুদ্দি চায়, বিদেশে বিক্রির জন্য। তার বিনিময়ে আমিরুদ্দি যে টাকা পাবে তা দিয়ে হয়তো বিদেশী হওয়ার নোটিশ ফেরাতে পারবে। তাই সেই কঙ্কালকে ঘিরেই আমিরুদ্দির অসহায় অক্ষম আক্রোশ—

> "তোমার যে ঠিক এই অবস্থাটাই আমার চাই আব্বা।...অন্তত একবার আমাকে পৃথিবীতে কষ্ট দিতে আনার কষ্ট তুমি ভোগ করে দেখো। সেই ছোটবেলায় অভুক্ত পেটে চায়ের দোকানে খাটতে পাঠানো থেকে আজকের এই নোটিস তাড়া করা জীবনের স্বাদ একবার ভোগ করে দেখো। আমার হৃদ - আদালতে তুমি যে গুরুতর অপরাধী আব্বা। তোমার শাস্তি হোক। তাই তোমাকে মরণোত্তর দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছি।"[২৩]

অথচ এই আক্রোশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আমিরুদ্দির অসহায় বুকভাঙা কান্নার ঝড়। গল্পের পরিণামে তাই নিজের কৃতকর্মের প্রতি অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয় আমিরুদ্দি। পরিশেষে বলা যায় গল্পটিতে জাতিসত্তার সমস্যা থেকে মনুষ্যত্বের সংকট বড় হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনের লেলিহান শিখায় মানুষ চিরকাল আক্রান্ত। শুধুমাত্র বরাক উপত্যকা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। যুগ পাল্টে গেছে, সমাজ পাল্টে গেছে,তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েও আমরা আজও যেন মধ্যযুগে অবস্থান করছি। স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পরও, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মসুলমান-বৌদ্ধ-শিখ একসঙ্গে থেকেও, আজও ধর্মোন্মাদ মানুষের সংখ্যা অভাবহীন, বলা ভালো অগণিত। ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘৃণার চাষ আজও করছে মানুষ। এই ঘৃণার ঝড়েও সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিক চেতনাকে জাগাতে চান গল্পকার শেখর দাস তাঁর 'আজান' গল্পের মধ্য দিয়ে।

গল্পটির কথাবস্তু রচিত হয়েছে বরাক উপত্যকার কোন এক সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তদজনিত উত্তপ্ত পরিবেশকে কেন্দ্র করে। গল্পের সূচনা ঘটছে এমন একটা সকালের মধ্য দিয়ে —

> "কাঁপা কাঁপা ছন্দময় উচ্চারণে আজান, পাখির ডাক, বিবিধ প্রভাতি শব্দ, ঘরে ঘরে চুলার আঁচের ধোঁয়া, চা বানানোর পেয়ালা-পিরিচে-চামচে মৃদু টুনুর টানুর। এইসব আবহ আজ নেই। ফজরের আজান পড়েছে ঠিক, অদূরের মন্দিরের ভোরের আরতির শব্দ আসছে ঠিক। সব শব্দের মাঝখানে মোটরবাইকের ভটর ভটর ছন্নছাড়া।"[২৪]

এই দাঙ্গা, কারফ্যু ইত্যাদি ঘটনায় যখন গোটা গ্রাম সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত তখন অকুতোভয় রইছ আলী নিজের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে কারফ্যুর জন্য ঘরবন্দী মোহনবাবুর বাড়িতে সবজি দিতে আসে। তার ভাষায়—

> "তিনদিনের কারফিউ। আমরার তো কুনতা না কুনতা মিলের। আপনার অবস্থা বুজিয়ার একটা লাউ আসিল গাছো। আধাখান খালা আব্বার বাসাত দিছি। আর ইখানো আধাখান।"[২৫]

শুধু তাই নয়, প্রায় দশ লিটার কেরোসিনও দিয়ে গেছিল। এই উত্তপ্ত পরিবেশে মোহনবাবু রইস আলীকে সাবধান করে বলেছেন—

> "রইস, সাবধান থাকিও। ইরকম সময় দুশমন তালে তালে থাকে...তুমার মতন দুনিয়াটা হকলে দেখে না।"[২৬]

কিন্তু রইস আলি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস—

> "কাউর কুনো ক্ষতি করা আমার দিয়ানো তো নাই। কে কিতা করত। সব নিজ-র মানুষ।"[২৭]

পরবর্তীতে দেখা যায়, আশেপাশের গ্রাম, যেখানে সান্ধ্য-আইন এখন নেই, সেখানে শান্তি কমিটির মিটিং করছে রইস আলী—

> "গ্রামে -বেগ্রামে চক্কর মারের আর শান্তি কমিটি করের।"[২৮]

সঙ্গের তিনজনকে রইস বলেছিল তার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পরোপকারী এই রইস আলীর শেষ রক্ষা হয়নি। না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়নি রইসের। তারই সমধর্মের জোয়াদ আলির হিংসার শিকার হয় সে। জোয়াদের ভাষায়—

> "যেদিন মুখ থাকি সালমারে কাড়ি নিছলে, ওদিনউ কসম খাইছি লহু লাগে। তর।"[২৯]

'সাড়ে ছয় ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চির একখণ্ড চোখা ইস্পাত' রইস আলির তলপেটে প্রবিষ্ট হয়।

আসলে, রইস আলিকে নির্মাণের মধ্য দিয়ে আমাদের মানবিক সত্তাকে জাগাতে চেয়েছেন গল্পকার। আমাদের বন্ধ্যা চেতনার শিকড়ে জল দিয়ে তাই গল্প শেষে তিনি বলেন—

> "কোন সঙ্কটই বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অন্তত তীব্রতা। কোন কুয়াশাও বেশিদিন থাকে না। একদিন শীত গেল। কুয়াশা কাটলো।"[৩০]

এই রইস আলীরা হারিয়ে যায়না, আমাদের মনের গভীরে থেকে যায়। গল্পের তাই শেষ বাক্য

> "... কথাগুলো বলে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসেছিল রইছ আলী। মোহনবাবুর স্পষ্ট মনে আছে।[৩১]

উপসংহার: পরিশেষে উল্লেখ্য, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকা সত্ত্বেও বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চা নিজের মতো করে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষিক সংঘাত, ক্ষয়িত মানবিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদির বাস্তব প্রতিবেদন বরাকের বাংলা ছোটগল্প। কলমের কালিতে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন বরাকের গল্পকাররা। অতএব বরাক উপত্যকার তথা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের গল্প বৃহত্তর বাংলাসাহিত্যের জগতে স্বমহিমায় উজ্জ্বল বললে অত্যুক্তি হয় না।

তথ্যসুত্র:

১) সেন, সুকুমার: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, ১৯৪০ ইং; পৃ-২০৭।

২) ভট্টাচার্য, মিথিলেশ (সম্পা): 'মুখাবয়ব', বরাক কুশিয়ারার গল্প; ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-১, পশ্চিম ত্রিপুরা, ২০১১ ইং, পৃ-২৯ ।

৩) তদেব, পৃ-২৯।

৪) তদেব, পৃ-৩১।

৫) তদেব।

৬) তদেব।

৭) দে, মলয়কান্তি : ভট্টাচার্য পরম ও দাস সুজিত (সম্পা), : ‘আত্মপরিচয়’ ; প্রতিস্রোত, স্পন্দন, কুর্মি বাংলো রোড, অম্বিকাপট্টি , শিলচর-৭৮৮০০৪, আসাম ২০১০ ইং, পৃ-৫৭ ।

৮) তদেব, পৃ-৫৯।

৯) তদেব।

১০) তদেব, পৃ-৫৯।

১১) তদেব, পৃ-৬১।

১২) তদেব, পৃ-৬২।

১৩) তদেব।

১৪) তদেব।

১৫) তদেব।

১৬) চৌধুরী, দেবব্রত, ‘আব্বাজানের হাড়’, সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর, ২০১৬, পৃ-১১৮।

১৭) তদেব, পৃ- ১১৬।

১৮) তদেব, পৃ- ১১৭।

১৯) তদেব, পৃ- ১১৬।

২০) তদেব, পৃ- ১১৭।

২১) তদেব, পৃ- ১২০।

২২) তদেব, পৃ- ১২০।

২৩) তদেব, পৃ- ১২০।

২৪) তদেব, পৃ- ১২৫।

২৫) দাশ, শেখর: ‘কোষাগার’; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, বিধাননগর, মেদিনীপুর,কলকাতা-৭২১১০১, ২০০০ ইং, পৃ-৩১

২৬) তদেব, পৃ- ৩২

২৭) তদেব, পৃ- ৩৩

২৮) তদেব, পৃ- ৩৩

২৯) তদেব, পৃ- ৩৬

৩০) তদেব, পৃ- ৩৭

৩১) তদেব, পৃ- ৩৮